দীনবন্ধু প্রোডাকসন্স নিবেদিত
কড়ি ও কোমল
Released 8-11-1957
পপুলার ফিল্মস পরিবেশিত

সংগঠনে ...

দীনবন্ধু প্রোডাক্‌সন্সের প্রথম চিত্র

কে, কে, চৌধুরীর নিবেদন

কড়ি ও কোমল

কাহিনী—নিতাই ভট্টাচার্য্য   প্রযোজনা—সুকোমল দত্ত

চিত্রশিল্পী—প্রবোধ দাস ॥ চিত্রগ্রহণে—রমেন পাল, পরিমল দত্ত ॥ শব্দযন্ত্রী—অতুল চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত গ্রহণ—অতুল চট্টোপাধ্যায়, মিনু কাট্‌রাক (বম্বে ॥ পুনঃ শব্দযোজনা—মণি বোস
শিল্প নির্দ্দেশনা—সত্যেনরায় চৌধুরী ॥

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—অজিত ব্যানার্জ্জী, দীলিপ বোস ॥ সম্পাদনায়—মিহির ঘোষ ॥
শিল্প-নির্দ্দেশনা—ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ॥ বুমম্যান—বীরেন নস্কর ॥ শব্দগ্রহণে—সুজিত সরকার ।
সঙ্গীত—চিত্ত মুখার্জ্জী, অমল মুখার্জ্জী ॥ ব্যবস্থাপনায়—অসিত বোস, নিতাই সরকার, শান্তি দত্ত,
মহম্মদ রোস্তান্ ॥ রূপ সজ্জায়—মদন পাঠক, নিতাই সরকার ॥ পট শিল্পে—অমিতাভ বর্দ্ধন ॥
আলোক সম্পাতে—শম্ভু ব্যানার্জ্জী, দুলাল, নিতাই, কুণ্ডু, যাদব, কেনারাম হালদার ॥ পরিস্ফুটন—
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারিজ প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায়—খগেন পাঠক ॥
প্রচারবিদ—ফণীন্দ্র পাল ॥ স্থিরচিত্র—সাংগ্রিলা ॥ পরিচয় লিখন—সমীর রায় চৌধুরী ॥
প্রধান সহকারী পরিচালক—শশাঙ্ক সোম ॥ সম্পাদনা—সুবোধ রায় ॥ গীতিকার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
॥ আবহ সঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা ।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ ও ষ্টেনসিল হফ্‌ম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

রূপায়ণে—

রবীন মজুমদার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চাটার্জ্জী, তরুণ কুমার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, শ্রীপতি চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন,
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় অতুল চাটার্জ্জী, খগেন পাঠক, স্বরজিত ব্যানার্জ্জী
মণি শ্রীমানি, রসরাজ, রাধারমণ, রাখাল চৌধুরী, রবীন দেবদাস, কালী ব্যানার্জ্জী,
প্রভাত কমল, কবি. রথিন ঘোষ ও জ্যোতিপ্রকাশ ।
কমলা মুখোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, শুক্লা দাস, অজন্তা কর ।

কণ্ঠ সঙ্গীতে—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, ভূপেন হাজারিকা, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকার,
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী ঘোষাল, ও নির্ম্মল চৌধুরী সম্প্রদায় ।

অতিথি শিল্পী—প্রবীর কুমার, সুরেন্দ্র সিং, আনোয়ার হোসেন (তেজপুর)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকার, যতীন্দ্রনাথ মিত্র
অজিত বসু, আবুল হোসেন (তেজপুর)

সঙ্গীত পরিচালনা—ভূপেন হাজারিকা

পরিচালনা—মণি ঘোষ, অমল দত্ত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

পরিবেশনায়

◆ পপুলার ফিল্মস ◆

কাহিনী

চড়া ব্লাড-প্রেসারের রুগী মহেশবাবু। পুরাতন ভৃত্য জগন্নাথ ছাড়া এত বড় বাড়ীতে তাঁর আপনার আর যারা আছে তারা হল তাঁর মৃতঃধনী ভগ্নীপতির দুটি পুত্র। সলিল ও তার বৈমাত্রের ভাই সমীর। পিতার মৃত্যুর পর ছেলে দু'টি প্রতিপালন করার দায়িত্ব যেমন তাঁকে নিতেঃহয়েছিল, তেমনি আবার তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বেনামা করে গ্রাস করে নিতে কসুর করেননি। নিজের বৈষয়িক বুদ্ধির জোরে তিনি এদের সম্পত্তি বহুলঃপরিমাণে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সলিল গায়ক, সঙ্গীত পেশা করে সে আত্মনির্ভরশীল কিন্তু সমীরের ওপর তাঁর কোন ভরসা নেই, সঙ্কীর্ণমনা সমীরের আর যত দোষই থাক মদন চ্যাটার্জ্জির সুন্দরী বোন কৃষ্ণার প্রতি তার গভীর অনুরাগের মধ্যে কোনো মিথ্যা ছিল না।

মহেশবাবু একদিন তাঁর উইল শোনাবার জন্যে সকলকে ডেকে পাঠালেন, সলিল তার মামাবাবুর গলগ্রহ হয়ে থাকেনা। রেডিও ও রেকর্ডে গান গায়! নিজের ফ্ল্যাটে গানের স্কুলও খুলেছে।

মহেশবাবু সলিল সমীর ও তাঁর শ্যালক-কন্যা সুমিতার মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিলেন, প্রত্যেককে তাঁর বাড়ীর একটি অংশ ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন। শুধু সলিলের সম্বন্ধে তাঁর একটি সর্ত্ত ছিল। সলিল সুমিতাকে বিবাহ না করলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

যদিও সলিল ও সুমিতার হৃদয় একদা পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে এসেছিল কিন্তু সলিলকে নিতান্তবাধ্য হয়েই সুমিতার সঙ্গে মিলনের স্বপ্নরচনা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

সম্পত্তির লোভে সলিল মহেশবাবুর সর্ত্ত মেনে নিতে রাজী হল না। ভাগ-বাটোয়ারার জন্যে নগদ দেড়লক্ষ টাকা এটর্নি, সাক্ষী হিসাবে তাঁর আর এক শ্যালক ও প্রশান্ত

কৃষ্ণার ভাই মদন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সব বিফল হয়ে গেল।

মহেশবাবু ক্ষেপে গেলেন, সলিলের অসম্মতির দরুণ উইল আবার বদলানো প্রয়োজন। নগদ দেড় লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে পুনরায় জমা না দিয়ে মহেশবাবুর ঘরের আয়রণ-চেস্টে তুলে রাখা হল।

সলিলের এই অসম্মতির সূত্র ধরে অনেকের মনেই নানা জটিল ভাবনার উদয় হল। অনেক চাপা সন্দেহ যেন মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। বহুদিন থেকেই সমীরের ধারণা যে তার দাদা সলিল কৃষ্ণার প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণা সলিলের কাছে গান শেখে, তাদের মেলামেশার অন্তরঙ্গ ব্যবহার দেখে কৃষ্ণার মনের হদিস খুঁজে পায়না সমীর। সলিল না সমীর কে কৃষ্ণার বেশী প্রিয়?

সলিলের সুমিতাকে বিবাহ করার অসম্মতির সঠিক কারণ জানতে পারলেন মহেশবাবু প্রশান্ত-র কাছ হতে। সলিলের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সম্পত্তির প্রায় সর্ব্বস্বই দান করে গিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এক মধ্যবিত্ত অবস্থার সুগায়ক ছাড়া সলিলের আর কোন পরিচয় ছিল না। সেদিন সুমিতার পিতা সলিলকে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখান করেছিলেন। আত্মাভিমানী সলিল সুমিতার মনকে তার পিতার অসম্মতির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেছিল।

মহেশবাবু সব শুনে বুঝলেন সলিলের ওপর তিনি অবিচার করেছেন, তিনি স্থির করলেন সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে সলিলকেই তিনি ট্রাষ্টি করবেন। সমীর তাঁর এই ইচ্ছা আড়াল থেকে শুনে প্রমাদ গুণল। দাদা ট্রাষ্টি হয়ে তার অংশ যদি না দেয় তাহলে কৃষ্ণাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার আশা-ভরসা ত্যাগ করতে হবে।

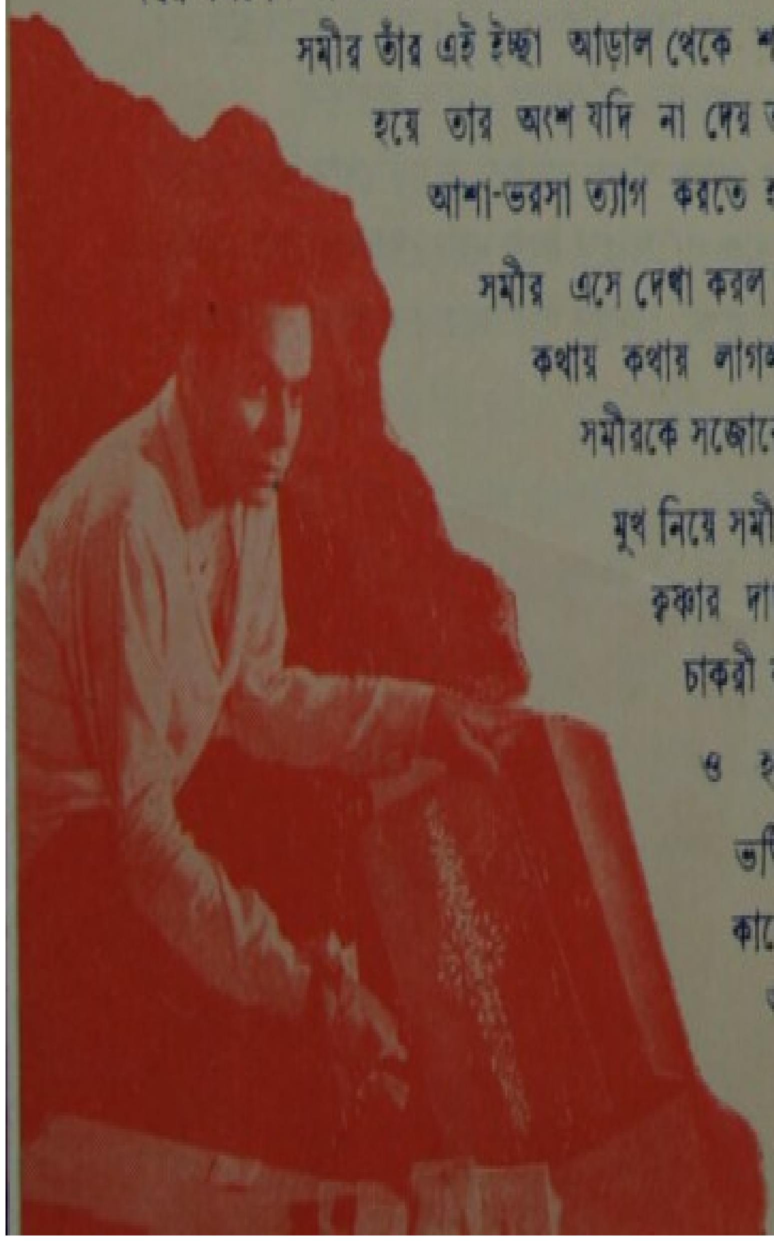

সমীর এসে দেখা করল সলিলের সঙ্গে, দুই ভায়ের মধ্যে কথায় কথায় লাগল তুমুল বচসা, রাগত সলিল সমীরকে সজোরে এক চড় মেরে বসল। রক্তাক্ত মুখ নিয়ে সমীর সলিলকে শাসিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণার দাদা মদন ইনসিওরেন্স অফিসে চাকরী করে। বাণ্ডিল করা দশ একশ ও হাজার টাকার নোটে স্যুটকেশ ভর্ত্তি করে তাকে নাকি অফিসের কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে, যাওয়ার আগে সে সমীরের কাছ থেকে কালো রংয়ের দামী একটি স্যুট ধার চাইল।

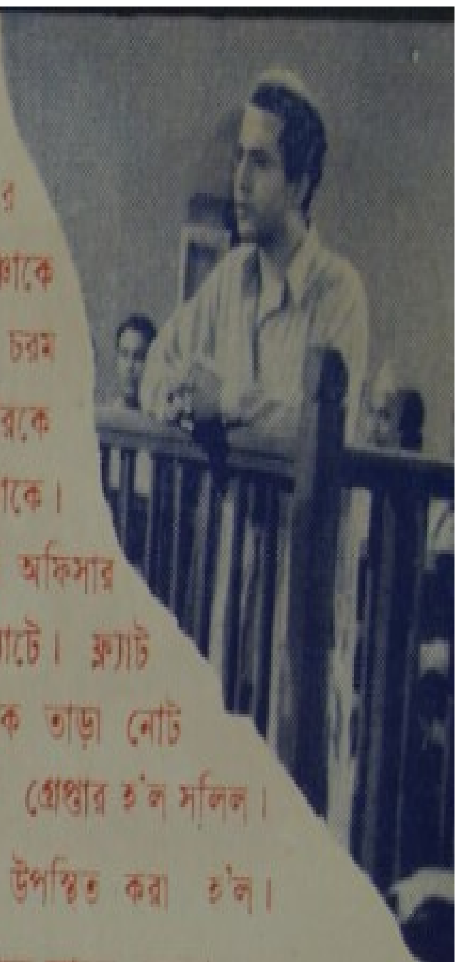

দাদার সঙ্গে রাগারাগি করে সমীর এল কৃষ্ণার কাছে। কৃষ্ণাকে সমীরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আজ চরম প্রমাণ দিতে হবে যে কৃষ্ণা সত্যি সমীরকে ভালবাসে। এই কথা সমীর জানাল কৃষ্ণাকে। তার পরদিন অতি প্রত্যুষে অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার প্রসাদ দাস সদলবলে হানা দিলেন সলিলের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট সার্চ করে পুলিশ একটি রক্তাক্ত রুমাল ও কয়েক তাড়া নোট আবিষ্কার করল, সমীরকে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হ'ল সলিল।

মহেশবাবুর বাড়ীতে মৃতদেহের সামনে সলিলকে উপস্থিত করা হ'ল। রিভলবারের গুলীর আঘাতে ও দোতলার বারান্দা থেকে আহত অবস্থায় পড়ে যাওয়ায় মৃতের মুখ দেখে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়না।

মদন সম্ভবতঃ তার বোন কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়েই গেছে, এদিকে সমীরকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কালো স্যুটে আবৃত মৃতদেহ—কালো স্যুটটি সমীরেরই।

আদালতে সাক্ষী ও জেরার জোরে সলিল যখন হত্যাকারীরূপে প্রমাণিত হয়ে এসেছে তখন সুন্দরী সুমিতার সাক্ষ্য নূতন পরিস্থিতি ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। সুমিতা আদালতে জানাল ঘটনার দিন, সারারাত্রি সলিল সুমিতার সঙ্গে একই ঘরে রাত কাটিয়েছে। কুমারী তরুণীর এই লজ্জাহীন স্বীকারোক্তিতে বিচারক সলিলকে সন্দেহ সাপেক্ষে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিল।

কিন্তু পুলিশ অফিসার প্রসাদ দাস হাল ছাড়লেন না। তাঁর স্ত্রী লতিকা মনে করেন সুমিতা সলিলকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা বললেও সলিল সত্যকারের হত্যাকারী নয়।

ঘটনাস্থলের মালিক মহেশবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হয়েছেন, বোধ করি রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে তাঁর একদিককার অঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে, কথা বলবার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন।

কে এই হত্যাকারী? সমীরই বা কোথায়? মদনই বা কোথায়? কাগজে কাগজে সলিলের মামলার চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেখেও কেনতারা ফিরে এল না? কোথায় গেল কৃষ্ণা?

গভীর এই রহস্য রোমাঞ্চিত কাহিনী কি করে সমাধান হ'ল তা রূপালী পর্দায় শেষ অবধি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করেই দেখতে হবে।

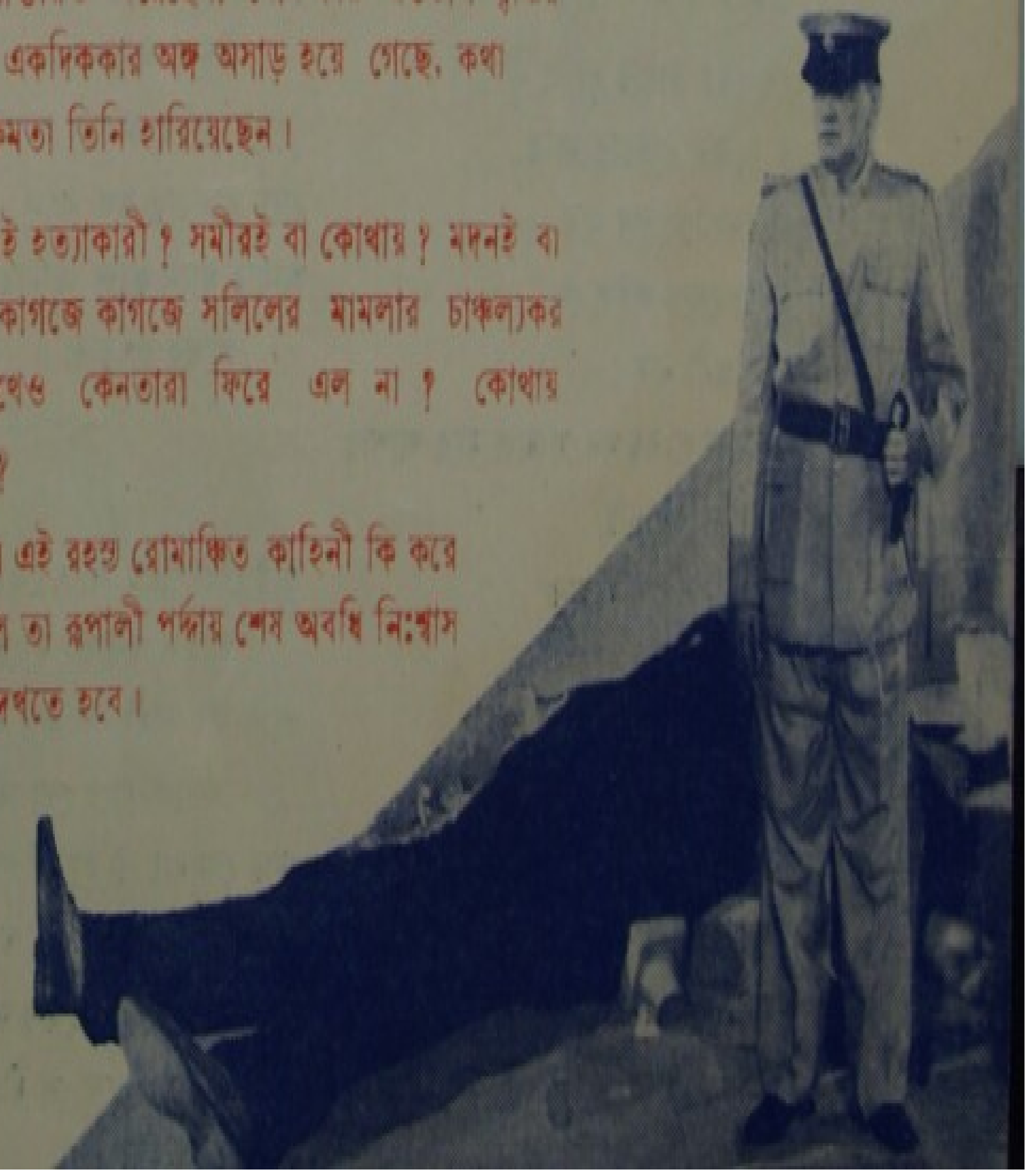

জীবনের এই পান্থশালায়
পথিক তুমি এলে
যাবার বেলায় একি
ভালবাসা রেখে গেলে ॥
যায় দিন যায় হাসি কান্নায়
চিরদিন কে থাকে বল পান্থশালায় ।
বাউড়ী হোয়ে খুজে বেড়াই রে
কোথায় আমার দেশ
(বল) না পাই পথের শেষ
ঘর চাই বাড়ী চাই ভাগ্যে নিরুদ্দেশ ॥
সমুখ পানে চলে চাকার গাড়ী
দাগ কেটে যায় পিছে
পথের বুকের ছবিটি তার
বাঁধতে চাওয়া মিছে
(সে যে) হারায় ধুলার নীচে ॥
ওরে ও সুজন নাইয়ার মাঝি
জানো কি তার ধাম
নারী হইয়া যেচে লইল যে
কলঙ্কিনী নাম ;
সোহাগ বড় জ্বালা বন্ধু মন যে জলে মরে আশায়
পীরিতি কী চায়,
ঘর চেয়ে যে এ-পথ আমার
কভু না ফুরায় ॥

—:•:—

অস্ত আকাশে দিনের চিতাজ্বলে
হংস বলাকা কুলায় ফিরে চলে
এলে না হায় বেলা যে যায়,
বেলা যে যায় ॥

ওগো বোঝোনা কেন আমি যে তোমার
শত জনমের চির আপনার—
যে ব্যথা দাও শুধু জানাও
তাতে কী পাও ॥
কত কথা ঝরে গেছে
গেঁথেছি অশ্রুহার
অবহেলার ছায়া ঘনায়
জানি না তুমি কোথায় ॥
সূর্য্য হারাণো সূর্য্যমুখী ফুল
মানবে কেমনে এ ভালবাসা ভুল
দিনগুলি সেই সোনালী আশায় ॥

—:•:—

কথা বলে শুক্লা:তিথির চাঁদিনী
কথা বলে কুঞ্জ কুহর রাগিনী
তোমায় চেয়ে অবাক হয়ে ফুরিয়ে
গেছে কথা
একি আমার নীরবতা
একি মধুর নীরবতা ॥
লাখো তারার বীণাপানি
আলোর ছোঁয়ায় দেয় বাণী
চৈতি হাওয়ার কথা মাখে
লজ্জাবতী লতা ॥
তীরের কানে নীর যে আনে
তরঙ্গেরিব্যথা
মেঘের বুকে বারিধারার
উছল আকুলতা ।
ফুলের চোখে কাজল অলি
নাচে হাওয়ায় কথা কলি
আমার গানে ছন্দে জানায়
পথের কথকতা ॥

—:•:—

তীর বেঁধা পাখি আমি জেগে থাকি
আহত একাকী নীড়ে
ওগো ওর সাথী বল কত রাতি
বিফলে যাবে গো ফিরে ॥
মোর বেদনায় ঐ দূরের পাহাড়
উদাস নয়ন মেলে স্বপ্ন ভাঙ্গার
উছল বাতাসে কথা মোর ভাসে
যে পথে চলে সে ধীরে ॥

সম ব্যথায় ঝরা পাতার
চোখে শিশির কাঁদে
তোমায় চাওয়া ভুল হল মোর
হায় কি অপরাধে ॥
আমার প্রদীপ অকূল আঁধারে
দিশা ভুলে ভয়ে কাঁপে
মোর প্রেম ভরে কোন অভিশাপে
সাতটি তারেতে বীণা শুধু কেঁদে
হায় শেষে কি গো যাবে ছিঁড়ে ॥

—:•:—

মনে আমার গত শ্রাবণের
ঝরো ঝরো বৃষ্টি বিরাম হারা
কার যেন মঞ্জীর অশান্ত অস্থির
স্মরণের গুঞ্জনে কে দেয় সাড়া ॥
নির্মেঘ শান্ত আকাশের খুলি দ্বার
উজ্জ্বল অতীতের জাগে মেঘ মল্লার
অপরূপ বরষার তরঙ্গ চেতনা
এ ভুবনে দেয় গো নাড়া ॥
বিদ্যুত ঝিলিমিলি নয়নেতে কার
মুখর ব্যথার মৃদু ঝংকার
অন্তর ভরা এই বিরহ বাতাসে
নিভে যায় সন্ধ্যাতারা ॥

—:•:—

ফাল্গুন মিতালীর স্বপ্ন জাগে
গুন্ গুন্ মধুপের ছন্দরাতে
নিজেই জানি না মন হারালো কোথায়
কেন আজ যত সাধ যত কথা গান হয়ে যায় !
কেন ভাবি এ লগন আসেনি আগে ॥
চম্পক বকুলের মুকুল মেলায়
মন শুধু ভরে থাক মধুর খেলায়
কি হবে গো খুঁজে ফুল ফোটার কারণ
সে যখন ভালই লাগে ॥
যদি গান চায় প্রাণ গাওনা তবে
মন নিয়ে খেলা করে আজ কি হবে
সুরে সুরে বেয়ে চল গানের খেয়া
ভেবোনা কে গো আলো কে গো আলেয়া ॥

—:•:—

সাধের ভাইরে আমার
নামলে কেন গহিন জলে না-জেনে সাঁতার
শুন শুন সভার মাঝে গুণের কথা গাই
ডুব সাঁতারে ভাই-য়ের জোরা ত্রিভুবনে নাই
উথাল পাতাল রস-সাগরে ভালো সাঁতারী
বাক্য ছলে মন মজাতে তুলনা নাই তারি।
দৈত্যবংশে জন্মেছিল নিকুম্ভ অসুর
সুন্দ উপসুন্দ তার দুই পুত্র শূর।
কন্যা দেখে উপসুন্দ কহে দিলাম প্রাণ
ভাইরে তোমার সম্পর্কেতে হল সে বৌঠান।
সুন্দ কহে কন্যা আমায় সত্যি ভালোবাস
ভাসুর ঠাকুর তোমায় দেখে ভক্তি শ্রদ্ধা আসে
ও রঙ্গিল ভাসুরগো তুমি কেন দেওর হলে না
তিলোত্তমা কন্যার কাছে নাইতো কোনো মানা
মানা তো নেই গোলক ধাঁধায় রাস্তা যে নাই জানা
লম্ফ দিলে মচকাবে পা খিলবে ডোবা খানা
সন্ধি হবে ডুগবে ঘরে মরবে শেষে কাশে
তিলোত্তমা কন্যা শুধু ফিকির ফিকির হাসে।

—:•:—

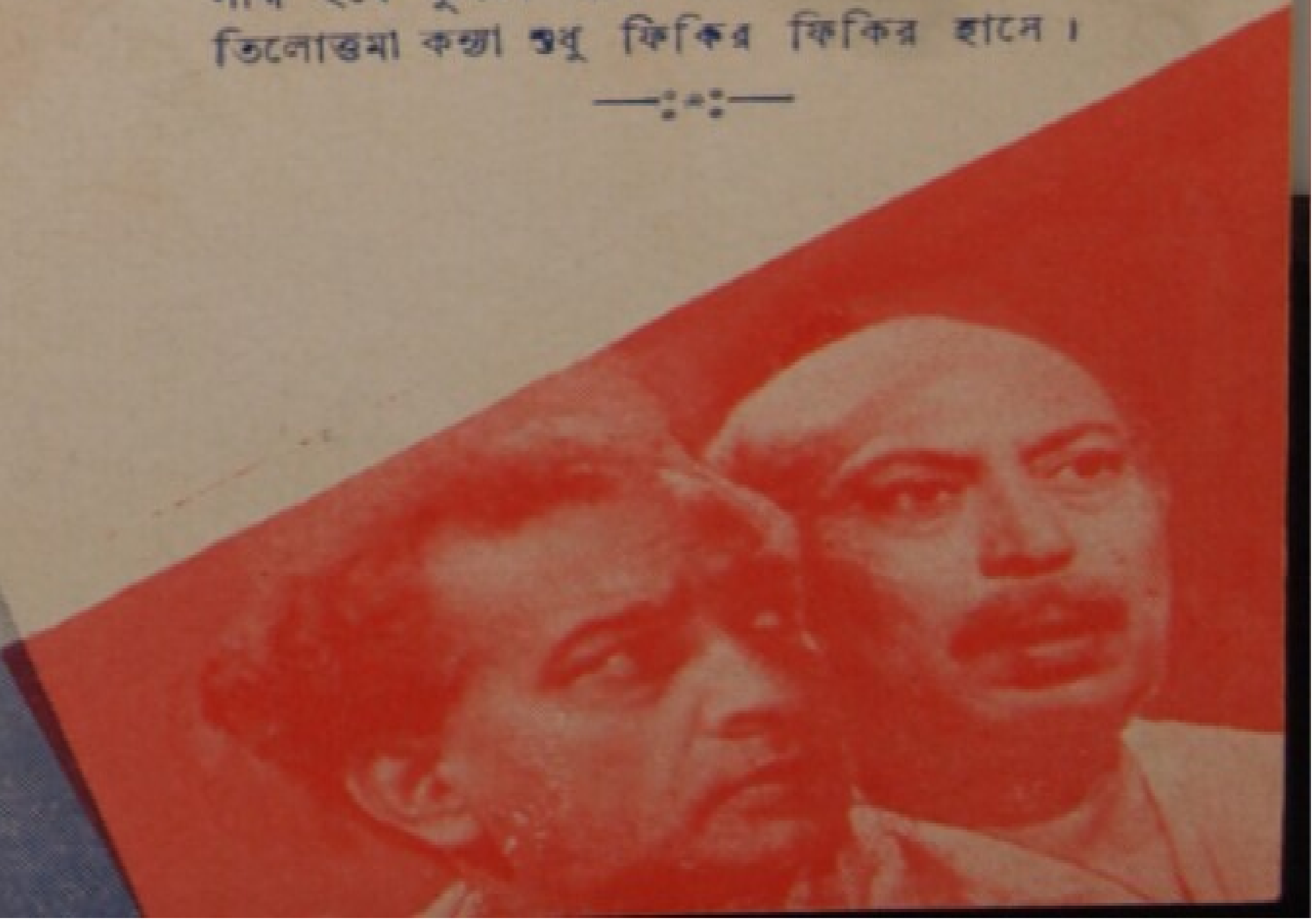

দীনবন্ধু প্রোডাকসন্সের

আগামী নিবেদন

মশালের ঘনাদা

অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত অদ্ভুততম এক
কীর্তিকাহিনী রহস্যে রোমাঞ্চে ভরপুর

রচনা ও
পরিচালনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র